শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা

শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা
প্রকাশক
মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
কামিয়াব প্রকাশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
ফোন ৭১১২২০৪, ৭১২৪১০৯, ০১৭১-৫২৯২৬৬

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৪
মূল্য
আট টাকা মাত্র
(একদামে ক্রয় করুন)
প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন
বর্ণবিন্যাস
কামিয়াব কম্পিউটার সেকশন
মুদ্রণ
কালারমাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং

সূচিপত্র

শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা

আমাদের দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কথাটি যেরূপ কুয়াশাচ্ছন্ন, 'ইসলামী শিক্ষা' কথাটিও তেমনি অস্পষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এদেশে প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতির মাদরাসা শিক্ষাই যদি ইসলামী শিক্ষা হয় তাহলে প্রতিভাবান ছাত্রদের এ শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই এবং সমাজে উন্নতি ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে কোন অভিভাবকই তাদের সন্তানদের এ শিক্ষা দিতে রাজি হবে না। আর ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাই যদি আদর্শ শিক্ষা বলে প্রচারিত হয় তাহলে এ শিক্ষার ফল দেখে কোন ইসলামপন্থী লোকই সন্তুষ্টচিত্তে এ ধরনের শিক্ষাকে সমর্থন করতে পারে না। যারা ইসলামী মূল্যমান ও মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব দেখতে চায়, তারা প্রচলিত দুটি শিক্ষাব্যবস্থার কোনটিকেই আদর্শ শিক্ষা বলে স্বীকার করতে পারে না। তাই বর্তমান যুগে দুনিয়াতে শান্তি ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করে আখিরাতের আদালতে মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সম্মুখে হাজির হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যেসব অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার অন্বেষণ করেন, তারা রীতিমতো এক মহাসংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। মাদরাসার শিক্ষা দ্বারা পার্থিব কোন যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। আর আধুনিক শিক্ষায় ইসলামী চরিত্র সৃষ্টিই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আধুনিক দুনিয়ার উপযোগী ইসলামী শিক্ষা কোন্ ধরনের হবে তা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। সরকারি পর্যায়ে এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু না হলেও যাতে আগ্রহশীল লোকদের প্রচেষ্টায় একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা যায়, সেদিকে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনার অবতারণা করছি।

যেহেতু বর্তমান শিক্ষাসংকট থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায়ই ইসলামী শিক্ষার রূপ সম্পর্কে আলোচনা করছি, সেহেতু বর্তমান পটভূমিকে সম্মুখে রেখেই আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে। তাই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করতে হবে।

এ ব্যাপারে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশেষ করে আমাদের শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করা অত্যন্ত জরুরি মনে করি।

প্রথমত, শিক্ষা বলতে কি বুঝায়, তা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

দ্বিতীয়ত, মানুষের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা রচনাকালে মানুষের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। মানুষকে দেহসর্বস্ব জীব মনে করলে শিক্ষাব্যবস্থায় আত্মার বিকাশ লাভের কোন বন্দোবস্তই থাকবে না। আবার মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনের দিকটি উপেক্ষা করে একমাত্র আত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা পদ্ধতি কায়েম হবে তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, যে ধরনের লোক তৈরি করা শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারিত হবে, সমগ্র

শিক্ষাব্যবস্থাকে তদনুযায়ী পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে জাতীয় জীবনাদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যে আদর্শকে জাতির লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত করা হবে, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সে আদর্শের উপযোগী চরিত্রই গঠন করতে হবে।

চতুর্থত, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মূল ত্রুটি কোথায়, তা সঠিকরূপে অবগত না হলে শিক্ষা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কেননা রোগের প্রকৃত কারণ না জানলে নির্ভুল চিকিৎসা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এই চারটি বিষয়ের মীমাংসা শিক্ষা পুনর্গঠনের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে শিক্ষার বাহ্যিক কাঠামো, আধুনিক উন্নত শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন, শিক্ষার স্তরবিভাগ, শিক্ষার মানোন্নয়ন ইত্যাদির শ্রুতিমধুর ও মুখরোচক আলোচনা নিতান্তই অর্থহীন। রোগ নির্ণয় ও নির্ভুল চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করে রোগীকে যত সুন্দরভাবেই রাখা হোক এবং যতই সেবা-শুশ্রূষা করা হোক, রোগীর অবস্থার উন্নতি এসব বাহ্যিক ব্যবস্থা দ্বারা মোটেই সম্ভব নয়। সুচিকিৎসার সাথে এসব বাহ্যিক ব্যবস্থা যুক্ত হলে উদ্দেশ্য সফল হবার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষা কাকে বলে?

শিক্ষার সংজ্ঞা সম্বন্ধে শিক্ষাবিজ্ঞানীদের দার্শনিক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে জনসাধারণের (Layman's) বোধগম্য ও সরল আলোচনাই প্রয়োজন। আমাদের চারপাশের যেসব জীব-জানোয়ারের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাদের মধ্যে শিক্ষার কোন কৃত্রিম প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই না। স্রষ্টা তাদের স্বভাবের মধ্যেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এরা বিচার-বিবেচনা করে, পরামর্শ ও গবেষণা চালিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করে না। এদের সহজাত বৃত্তির (Instinct) তাগিদেই প্রাকৃতিক নিয়মে তারা প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করে থাকে। কোন উস্তাদের কাছে সবক নিয়ে তারা শিক্ষা লাভ করে না। বয়স্ক জীবেরা ছোটদের শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে বলেও আমরা জানি না। জীবশিশুদের পিতামাতাকে তাদের সন্তান-সন্ততির উপযুক্ত শিক্ষার জন্য পেরেশান হতেও দেখা যায় না।

কিন্তু তাই বলে কি তাদের শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই? প্রত্যেক জীবেরই জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। নিতান্ত বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তাদেরকে কাজ করতেও আমরা দেখতে পাই। জীবশিশু তার পূর্ণ বিকাশ লাভের উপযোগী গুণাবলিও অর্জন করে থাকে। এসব মেনে নেওয়া সত্ত্বেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষের ন্যায় 'বুদ্ধি' প্রয়োগ দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করে তাদেরকে শিক্ষা লাভ করতে হয় না।

মানবশিশুর বিকাশ, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত তার পিতামাতা এবং অন্যান্য শিক্ষকের উপর যেরূপ নির্ভরশীল, অন্যান্য জীবের মধ্যে সেরূপ নির্ভরশীলতার প্রয়োজন হয় না। মানবশিশু আগুনকে খেলার জিনিস মনে করে তাতে হাত দেয়, নিজের পায়খানাকে হালুয়ার মতো মুখে দেয়। কিন্তু কোন বিড়ালশিশুকে এরূপ করতে দেখা যায় না। যে কুকুর মানুষের মলকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তার শিশুকেও কোনদিন নিজের পায়খানা

মুখে দিতে দেখা যায় না। মানুষের শৈশবকাল এতো দীর্ঘ যে, পনেরো-বিশ বছর পর্যন্ত তাকে পিতামাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে উপযোগী গুণাবলি অর্জন করতে হয়। অথচ মানুষের চেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণীদের বেলায়ও এরূপ নির্ভরশীলতার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং দেখা যায় যে, মানবশিশুকে ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম প্রচেষ্টা দ্বারা যা শিক্ষা দিতে হয়, অন্যান্য জীবশিশু তা সহজাত বৃত্তি দ্বারা আপনা-আপনিই লাভ করে থাকে।

কিন্তু মানুষের যাবতীয় জ্ঞানের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে মানুষের শিক্ষার সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

"প্রয়োজনীয় গুণাবলি ও জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ব্যবস্থার নামই শিক্ষা।"

এ ধরনের শিক্ষা একমাত্র মানুষেরই প্রয়োজন। অন্যান্য জীব-জানোয়ার এ ঝামেলা থেকে মুক্ত। কোন্‌টা খাওয়া ঠিক ও কোন্‌টা ঠিক নয়, তা জানার জন্য ছাগশিশুর নাসিকাযন্ত্রের সহজাত ক্ষমতাই যথেষ্ট। কিন্তু মানবশিশুকে তা বড়দের নিকট থেকে শিখতে হয়।

শৈশবকালে মানুষও সহজাত বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয় বটে; কিন্তু যতই তার বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই উক্ত সহজাত বৃত্তি বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানব চরিত্র গঠনের প্রাথমিক স্তরে বালক-বালিকারা ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞানার্জন করার চেষ্টা না করলেও বড়দের ইচ্ছাকৃত চেষ্টার ফলেই তখন তারা শিক্ষা লাভ করে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা নিজেরাই চেষ্টা করে জ্ঞানার্জন করতে অভ্যস্ত হতে থাকে।

মানুষের পরিচয়

মানুষ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ব্যতীত যদি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয় তাহলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হতে পারে না। তাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন।

মানুষ সৃষ্টিজগতের বহু রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগেই বস্তুজগতের বিভিন্ন শক্তিকে নিজের উপকারে ব্যবহার করেছে। কিন্তু ওহীর জ্ঞান ব্যতীত এবং নবীদের শিক্ষা ব্যতীত কোন কালেই মানুষ তার নিজের প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে এতো বিপুল শক্তির অধিকারী করেছে যে, মানুষ আজ পাখির চেয়েও দ্রুত উড়তে সক্ষম এবং দ্রুততম প্রাণীর চেয়েও অধিকতর বেগে চলার উপযোগী যানবাহনের অধিকারী। এমনকি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বিচরণের ক্ষমতায়ও ভূষিত হয়েছে। কিন্তু 'প্রকৃত মানুষ' হিসেবে দুনিয়ায় জীবনযাপন করার উপযোগী শিক্ষা থেকে আধুনিক মানুষ বঞ্চিতই রয়ে গেলো।

এর মূল কারণ এই যে, মানুষ নিজেকে ভালোভাবে চিনতে সক্ষম হয়নি। শুধু বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষ নিজেকে চিনতে অক্ষম বলেই মানুষের মহান স্রষ্টা রাসূলের মারফতে যুগে যুগে মানুষকে আত্মজ্ঞান দান করেছেন। তাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে আমাদেরকে কুরআন মাজীদের নিকট 'ধরনা' দিতে হবে।

কুরআনে মানুষের পরিচয়

কুরআন অন্যান্য জীবের সাথে মানুষের যে ব্যবধান নির্দেশ করে তা এই যে, 'মানুষ নৈতিক জীব' আর অন্যান্য জীব নৈতিকতার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভালো ও মন্দ, সৎ ও অসৎ, সত্য ও মিথ্যার বিচার করার ক্ষমতা মানুষ ছাড়া আর কোন জীবের মধ্যে আমরা দেখতে পাই না। মিথ্যার বেসাতিই যার সম্বল, সে মানুষটিও 'মিথ্যা বলা অন্যায়' বলে স্বীকার করে। মিথ্যা বলাকে ভালো কাজ মনে করলে সে 'মিথ্যুক' উপাধিতে ভূষিত হওয়া পছন্দ করতো। 'চুরি করা খারাপ'এ কথা স্বীকার করে বলেই চোর প্রকাশ্যে না গিয়ে গোপনে চুরি করতে যায়। ভালোমন্দের এই বিচারজ্ঞানই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে পৃথক করেছে। যারা এই নৈতিক দিককে উন্নত করার চেষ্টা করে না, কুরআন তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে যে,

اولئك كالانعام بل هم اضل ـ

"তারা পশুর ন্যায়; বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।" নৈতিকতার উন্নতি ব্যতীত মানুষ তার যাবতীয় শক্তি যখন ব্যবহার করে তখন সে পশুর চেয়েও অনিষ্টকর ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি মানুষের বিরাট অস্ত্র। এ অস্ত্রের সাহায্যে শারীরিক আকারে ক্ষুদ্র হয়েও সে বিরাট বপুবিশিষ্ট হাতীর উপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু নৈতিকতার বিকাশ না হলে এই বুদ্ধিশক্তিকেই সে মানব জাতির অকল্যাণে প্রয়োগ করে। কথা বলার শক্তি নিশ্চয়ই অন্যান্য জীবের চেয়ে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। কিন্তু নৈতিক অবনতির ফলে যখন কেউ মিথ্যা বলে তখন সে কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে পড়ে। কেননা কুকুর মিথ্যা বলতে পারে না। তাই বস্তুগত শক্তির সঠিক ব্যবহার নৈতিকতার উপরই নির্ভরশীল। একটি ছুরি নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির হাতে ব্যবহৃত হলে তা মানুষের উপকারই করবে। কিন্তু নৈতিকতার অভাব হলে এ ছুরিই তাকে ডাকাতে পরিণত করবে। নৈতিকতার বিকাশ ব্যতীত আধুনিক বিশ্ব এতো প্রচণ্ড বস্তুশক্তির অধিকারী হয়েছে বলেই আজ মানব জাতি এতো বড় সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আণবিক শক্তি ও মহাশূন্যের ব্যবহার আজ মানব জাতির অস্তিত্বকে শঙ্কাকুল করে তুলেছে। কেননা এসব শক্তি নৈতিকতায় ভূষিত মানবের হাতে ব্যবহৃত হচ্ছে না, নৈতিকতাহীন দানবের হিংস্র থাবা দ্বারাই এদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

কুরআন হাত, পা, চোখ-কানবিশিষ্ট শরীরটিকে প্রকৃত মানুষ মনে করে না। কুরআনের মতে, এ দেহ সৃষ্টির বহু পূর্বে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। কুরআনের পরিভাষায় সেই মানুষটিই হলো 'রূহ' বা আত্মা। এ আত্মাই নৈতিকতার আধার। রূহকে উন্নত করার ব্যবস্থা না করলে এ শরীর পশুর ন্যায় ব্যবহার করবে। শরীরের যত সব বস্তুগত দাবি আছে তা পূরণের জন্য মানবদেহ সকল সময়ই ব্যস্ত। পেট খালি হলেই সে খাদ্যের জন্য ব্যস্ত হয়। মানুষ সেই খাদ্য চুরি করে আনলো, না পরিশ্রম করে অর্জন করলো সে বিষয়ে পেটের কোন মাথাব্যথা নেই। তার খাদ্যের প্রয়োজন। অন্যায়ভাবে খাদ্য এনে দিলেও সে নিশ্চিন্তে খেতে থাকে। কিন্তু তখন রূহ বলতে থাকে যে, কাজটা অন্যায় হলো। গৃহপালিত পশু রজ্জু ছিঁড়ে নিজেরই দয়ালু মনিবের সাজানো বাগান খেতে একটুও

দ্বিধাবোধ করে না। নৈতিকতার বন্ধন ছিঁড়তে পারলে মানবদেহও তেমনি একটি পশুতে পরিণত হয়। মহানবী (স) তাই নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষকে এমন এক ঘোড়ার সাথে তুলনা করেছেন, যা রজ্জু দ্বারা এক খুঁটির সাথে আবদ্ধ। এ ঘোড়াটি যেমন স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে না তেমনি মানুষের স্বাধীনতাও নৈতিকতার রজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই কেবল রজ্জুর সীমা পর্যন্তই সে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে সক্ষম।

দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব

উপরিউক্ত আলোচনা ছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্তিই তার বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষের আত্মার সাথে তার দেহের এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব লেগে আছে। মানুষ অনেক নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপ হতে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে, কিন্তু অনেক সময় দেহের তাগিদের নিকট পরাজয় বরণ করে। এ দ্বন্দ্বে দেহের জ্বালায় অস্থির হয়েই একশ্রেণীর মানুষ নৈতিকতার চাপে বৈরাগী হওয়ার প্রেরণা লাভ করে। তারা 'দরবেশ' ও 'সন্ন্যাসী' হলেও মানুষের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা নির্জীব পাথর ও নিশ্চল গাছের ন্যায় জীবন-যাপন করে মনুষ্যত্বের উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়। আবার অন্যদিকে অধিকাংশ লোক দেহের নিকট পরাজিত হয়ে আত্মাকে পঙ্গু করে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে। কুরআনে মানুষকে এ দ্বন্দ্বে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যে বিধান দিয়েছে, তা দেহের সকল দাবিকে নৈতিকতার সীমার ভেতরে পূরণ করতে সাহায্য করে। দেহের দাবিকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে কুরআন বলে, "বৈরাগ্য সাধনের নীতি মানুষ নিজেই আবিষ্কার করেছে, আমরা তাকে এ নির্দেশ দান করিনি।" (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)

আত্মা ও দেহের দ্বন্দ্বে দেহকে অস্বীকার করার বৈরাগ্য নীতি যেমন মানুষের উপযোগী নয়, তেমনি আত্মাকে পরাজিত করে পশুর ন্যায় ভোগবাদী জীবন যাপনও মানুষের অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মাঝামাঝি মনুষ্যত্বের সিরাতুল মুস্তাকীমই কুরআনের শেখানো পথ। তাই কুরআনের মতে মানুষ আত্মাহীনও নয়, দেহহীনও নয়; আবার আত্মাসর্বস্বও নয়; দেহসর্বস্বও নয়; বরং সে দেহ ও আত্মা উভয়েরই সমন্বয়। এখানে দেহ আত্মার বাহন, আর আত্মা দেহেরই পরিচালক।

প্রবৃত্তি ও বিবেক

সাধারণ অর্থে দেহের দাবিকে নাফস বা প্রবৃত্তি এবং আত্মাকে বিবেক বলে অভিহিত করা চলে। মানবদেহের ইন্দ্রিয়সমূহকে বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ আকর্ষণই প্রবৃত্তি। একদিকে দুনিয়ার আকর্ষণীয় বস্তুসমূহের প্রতি মানুষের তীব্রভাবে আকৃষ্ট হওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তাকে সৎ ও অসৎ এবং ভালো ও মন্দ সম্বন্ধে সচেতন বিবেকশক্তি দান করা হয়েছে। এভাবে মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি ও বিবেকের বিপরীতমুখী তাড়না সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় যখনই বিবেকের বিপরীত কাজ করে তখনই বিবেক তাকে দংশন করতে থাকে। দেহ অসুস্থ হলে যেমন এর আকর্ষণীয় বস্তুর দিকে ধাবিত হয় না; তেমনি বিবেক অসুস্থ হলেও তার দংশন করার শক্তি হ্রাস পায়। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন না করলে যেমন দেহ অসুস্থ হয়, তেমনি বিবেকের

বিরুদ্ধে বারবার চললে বিবেকশক্তি লোপ পেতে থাকে। এ দুটি শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপরই মানব জীবনের শান্তি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

মানুষের উপযোগী শিক্ষা

মানুষকে যারা আত্মাবিহীন এক জড় পদার্থ মনে করেন, তারা শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করার বেলায় মানুষের শুধু বস্তুগত প্রয়োজনের (Material need) দিকেই লক্ষ্য রাখেন। আর মানুষের প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করতে অক্ষম হওয়ার ফলে সে ব্যবস্থায় মানুষকে অন্যান্য জীবের ন্যায়ই দেহসর্বস্ব মনে করে গড়ে তোলা হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ধর্মনিরপেক্ষ ও খোদাবিমুখ বলে তার পক্ষে মানুষকে আত্মাপ্রধান হিসেবে চিনবার সুযোগ হয়নি। ডারউইন মানুষকে বানরের উন্নত সংস্করণ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এ মতাদর্শে বিশ্বাসীরা মানুষকে অন্যান্য পশুর ন্যায় গড়ে তুলবার উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করেছেন। এ শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।

আবার যারা মানুষকে আত্মাসর্বস্ব মনে করেন অথবা তার জৈবিক প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ না দিয়ে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রচলন করেন, তাঁরাও মানুষের উপযোগী প্রকৃত শিক্ষা দিতে অক্ষম। এ শিক্ষা মানুষকে যতই খোদাভীরু ও ধর্মপ্রাণ হওয়ার অনুপ্রেরণা দান করুক, বাস্তব জীবনে বস্তুগত প্রয়োজনের তাগিদ তাকে ঈমানের বিপরীত পথে যেতে বাধ্য করে। তাই এই প্রকার শিক্ষাও মানুষের স্বভাবের বিপরীত।

তাই যে শিক্ষা মানুষের আত্মা ও দেহকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যময় পরিণতিতে পৌঁছিয়ে এ জগতের রূপ-রস-গন্ধকে নৈতিকতার সীমার মধ্যে উপভোগ করার যোগ্যতা দান করে, সেই শিক্ষাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে মানবতার উন্নতি ও নৈতিকতার বিকাশে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাই মানুষের উপযোগী শিক্ষা। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি দান করা সত্ত্বেও যে শিক্ষা মনুষ্যত্ব ও আত্মার উন্নতিকে ব্যাহত করে তা প্রকৃতপক্ষে মানব-ধ্বংসী শিক্ষা, তাকে কিছুতেই মানুষের উপযোগী শিক্ষা বলা চলে না।

শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় আদর্শের স্থান

দুনিয়ার সকল শিক্ষাবিদই এ বিষয়ে একমত যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র গঠন। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মন, মস্তিষ্ক ও চরিত্রকে গঠন করার চেষ্টা প্রত্যেকটি সজাগ জাতির কার্যসূচির প্রধান অঙ্গ। উন্নত জাতিসমূহের শিক্ষাব্যবস্থায় বাহ্যিক দিক দিয়ে অনেক সামঞ্জস্য থাকলেও মূলত তাদের সকলেরই একই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি উদ্দেশ্য নয়। আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় যে প্রকার মন, মস্তিষ্ক ও চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে, রাশিয়ায় হুবহু তার অনুকরণ হচ্ছেনা। এর প্রকৃত কারণ হল তাদের আদর্শের পার্থক্য। ভালো-মন্দের পার্থক্যজ্ঞান, মূল্যবোধ, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তিচরিত্রের মান নির্ণয়, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কতক ধারণা ইত্যাদির সমন্বয়েই একটি আদর্শ গড়ে উঠে। যে জাতির নিকট যে আদর্শ গ্রহণযোগ্য, সেই আদর্শকে সম্মুখে রেখেই উক্ত জাতির শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হয়।

প্রত্যেক দেশের কোন না কোন আদর্শ থাকে। সে আদর্শ নিজস্বও হতে পারে অথবা অপর কোন দেশের নিকট থেকে ধার করাও হতে পারে। কিন্তু কোন আদর্শ নির্ধারণ ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতির পথে পদক্ষেপ করতে পারে না। আদর্শ একটি জাতির লক্ষ্য। যে জাতির কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, সে অপরাপর জাতির উচ্ছিষ্টভোগী হতে বাধ্য। একটি বিশেষ আদর্শে জাতিকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত প্রকার পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক তা শেষ পর্যন্ত একই লক্ষ্যের দিকে দেশকে পরিচালিত করবে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের বেলায় জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ অপরিহার্য।

আমাদের জাতীয় আদর্শ

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ কী এ বিষয়ে বিরাট মতপার্থক্য রয়েছে। এটাই এ দেশের প্রধান সমস্যা। এ কারণেই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের গোলামী থেকে স্বাধীন হওয়ার পর গত ৫০ বছরেও দেশের সকল নাগরিকের উপযোগী কোন সমন্বিত শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

১৯৪০-এর দশকে এ উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভের সুযোগ আসে। মি. গান্ধি ও মি. নেহেরুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদকে জাতীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করে। উপমহাদেশের ঐ সময়ের ১০ কোটি মুসলমানের পক্ষ থেকে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ইসলামকে জাতীয় আদর্শ ঘোষণা করে।

১৯৪৬ সালে এ ইস্যুকে কেন্দ্র করেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলমানদের শতকরা ৯৭টি ভোট ইসলামের পক্ষে পড়ে। ফলে আদর্শিক ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি আদর্শিক রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পাকিস্তানের শাসন-ক্ষমতা যাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল তাঁদের মন-মগজ-চরিত্র ইংরেজ আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থায়ই গড়ে উঠায় তাঁরা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শে ঢেলে সাজাবার কোন চেষ্টাই করেননি। তাঁরা ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই বহাল রাখানে। কিন্তু তাঁরা ব্রিটিশ আমলের শিক্ষার মানটুকুও বহাল রাখতে ব্যর্থ হন।

যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান কায়েম হয় সে আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শাসকরা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাও চালু রাখা নিরাপদ মনে করেননি। অথচ জনগণের ভোটের মাধ্যমেই পাকিস্তানের জন্ম। গণতন্ত্র বহাল থাকলে জনগণ ইসলামী আদর্শের পক্ষেই ভোট দেবে মনে করেই আইয়ূব খান সামরিক স্বৈর-শাসন জারী করেন। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান কায়েম হওয়া সত্ত্বেও সে আদর্শের লালন না করায় আদর্শিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে গেল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ঐ শূন্যস্থান পূরণ করল। পরিনামে এদেশটি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শাসকগণ ঐসব ইসলাম বিরোধী মতবাদকেই জাতীয় আদর্শ হিসেবে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। ভারত থেকে আমদানী করা

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও রাশিয়া থেকে ধার করা সমাজতন্ত্র এদেশের মাটিতে শেকড় গাড়তে ব্যর্থ হয়। তাই গণভোটের মাধ্যমে ১৯৭৭ সালে জনগণ ঐ দুটো মতবাদকে বাতিল ঘোষণা করে। আর বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় বাংলাদেশী হিসেবে ঘোষণা করার ফলে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদও মতবাদ হিসেবে পরিত্যক্ত হয়।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হবার সুযোগ পেয়ে দলীয়ভাবে এখনও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বলে দাবি করলেও এ দুটো মতবাদ দেশের শাসনতন্ত্রে অনুপস্থিত। শাসনতন্ত্র দেশের যে আদর্শ ঘোষণা করেছে তা-ই জাতীয় আদর্শ। যারা সে আদর্শে বিশ্বাসী নয় তাদের ব্যাপারে জনগণই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বদলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' লেখা হয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের আদর্শ 'ইসলাম' বলে দাবি করলে তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সুতরাং আমাদের জাতীয় আদর্শ যে ইসলাম তা অনস্বীকার্য। যারা এ কথা অস্বীকার করতে চান তারা বলুন বাংলাদেশের আদর্শের নাম কী?

বাংলাদেশের আদর্শ ইসলাম বলে স্বীকৃত না হলে পশ্চিম বঙ্গ থেকে আমাদের আলাদা থাকার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। যারা এপার বাংলা ও ওপার বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করতে চান তাঁরা বাংলাদেশকে ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত করতে আগ্রহী। তাই একমাত্র ইসলামী আদর্শের ধারক হিসেবে বেঁচে থাকতে চাইলেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রয়োজন। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে বাংলাদেশের আদর্শ বলে মেনে নিলে ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে আলাদা হওয়ার কোন যুক্তি থাকে না।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হলে প্রথমেই জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। কোন্ ধরনের মানুষ গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করছি, তা-ই এক্ষেত্রে মৌলিক প্রশ্ন। আমাদের নিজস্ব কোন মত, বিশ্বাস, জীবনদর্শন, উদ্দেশ্য এবং জীবনধারা বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেন তারা আমাদের তাহযীব তমদ্দুনকে ভিত্তি করে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

জাতীয় আদর্শকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে মৌলিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমাদের দেশ ইসলামী জীবন বিধান সংরক্ষণের মাধ্যমেই বেঁচে থাকবে।

ইসলামী নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যমান এবং দেশের আযাদী, অখণ্ডতা ও দৃঢ়তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রেরণাদানকারী আদর্শ হতে হবে।

সুতরাং বাংলাদেশে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার, যার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপদানের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও কর্মী সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের আদর্শকে মানব জাতির মুক্তিবিধানরূপে

পেশ করার যোগ্য লোক তৈরি করতে হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিকের শিক্ষায় এবং সাহিত্যে ইসলামী নৈতিকতা, মূল্যমান ও মূল্যবোধের প্রাধান্য স্থাপন করতে হবে। কাজেই বস্তুগত জ্ঞানের সাথে নৈতিক শক্তির সমন্বয় সাধনই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হতে হবে। আমরা যদি গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হই তাহলে দিশেহারার ন্যায় অনিশ্চিত পথে চলে জাতিকে ধ্বংসের পথেই নিয়ে যাবো।

আমাদের শিক্ষা পুনর্গঠনের প্রধান সমস্যা

বর্তমানে আমাদের দেশে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। একটি হল প্রাচীন ধরনের মাদরাসা শিক্ষা এবং অপরটি আধুনিক শিক্ষা নামে পরিচিত। প্রথমটি 'ইসলামী শিক্ষা' বলে দাবি করে এবং দ্বিতীয়টি 'আধুনিক শিক্ষা' হিসেবে গৌরব বোধ করে। যারা মাদরাসা শিক্ষা লাভ করে, তারা কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি অধ্যয়ন করে বটে; কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার কোনই সুযোগ পায় না। ফলে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের যত প্রকার সমস্যা আছে, এর আধুনিক রূপ ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তারা কোন ধারণাই লাভ করে না। ফলে মানব সমস্যার যে সুষ্ঠু সমাধান আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীসে দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোন দৃষ্টিভঙ্গিই তারা লাভ করতে পারে না। এ কারণে দীর্ঘকাল মাদরাসায় কঠোর সাধনা করেও তারা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে তা আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন পূরণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এ মাদরাসাসমূহ কাওমী মাদরাসা নামে পরিচিত। অবশ্য আলীয়া মাদরাসায় আলিম ক্লাশ পর্যন্ত আধুনিক বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হয়।

আর যারা আধুনিক শিক্ষা অর্জন করে, তারা প্রচলিত দুনিয়ার ভালোমন্দ জ্ঞান অনেক কিছুই হাসিল করতে সক্ষম হয় বটে; কিন্তু মুসলিম হিসেবে জীবন যাপনের কোন প্রেরণাই তারা লাভ করে না। চিন্তা ও কর্মে তারা প্রায়ই অমুসলিম হিসেবে গড়ে উঠে। এ শিক্ষা পাওয়ার পরও যারা ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন, তারা ব্যক্তিগত ও প্যারিবারিক প্রচেষ্টায় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরের পরিবেশে নিজেদেরকে খাঁটি মুসলিমরূপে গঠন করেন। তারা নিয়মের ব্যতিক্রম।

এমতাবস্থায় আমাদের দেশে শিক্ষা পুনর্গঠন করা রীতিমতো জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি দেশের নাগরিকদেরকে উপযুক্তরূপে গড়ে তুলবার জন্য একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। দুই ধরনের শিক্ষিত লোক সমাজকে দুই বিপরীত দিকে টানতে থাকলে দেশের বিপর্যয় অনিবার্য। উপরিউক্ত দুই প্রকারের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা সৃষ্টি করে চলেছে। জাতীয় আদর্শ ইসলাম বলে স্বীকার করার পর ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা বলে দুই প্রকার শিক্ষা চলতে থাকার কোন অর্থই হয় না। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক করে তুলতে হবে এবং আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষার রূপ দিতে হবে। উভয় শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে এ কাজ অসম্ভব নয়।

পাকিস্তান আমলে শিক্ষা পুনর্গঠন প্রচেষ্টা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের যে কয়েকটি প্রচেষ্টা হয়েছে, তার কোনটিতেই ইসলামী রাষ্ট্রের উপযোগী নাগরিক গড়ে তুলবার ব্যবস্থা হয়নি। যতগুলো শিক্ষা কমিশন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য নিযুক্ত হয়েছে, তাদের কোনটিই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ার সুপারিশ করতে পারেনি। সকলেই ইসলামকে একটি ধর্মের মর্যাদা দিয়েছে মাত্র। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় খ্রিস্টধর্মকে যেটুকু স্থান দেওয়া হয়েছে, পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে মাত্র ততটুকু স্বীকৃতিই দেওয়া হয়েছে।

বস্তুত শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে গঠন করে এর সাথে Religious Instruction (ধর্মীয় শিক্ষা)-এর লেজটুকু জুড়ে দিলেই কোন শিক্ষাপদ্ধতি ইসলামী হয়ে যায় না। এ ধরনের অস্বাভাবিক সংযোগ দ্বারা আর যাই হোক, ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক গঠন করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

বাংলাদেশ আমলে শিক্ষা পুনর্গঠন প্রচেষ্টা

বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হওয়ার পর শেখ মুজীব সরকার "ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন" গঠন করেন। ঐ কমিশনের সুপারিশ স্বাভাবিক কারণেই তখনকার রাষ্ট্রীয় আদর্শ "ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র" অনুযায়ী প্রণীত হয়।

জেনারেল জিয়ার আমলে ১৯৭৬ সালে প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি" গঠন করা হয়। ১৯৭৮ সালে শিক্ষামন্ত্রি কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়।

জেনারেল এরশাদের আমলে ১৯৮৩ সালে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ. মজীদ খানের নেতৃত্বে 'মজীদ খান কমিটি' গঠন করা হয়। ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক মফিজুদ্দীন আহমদকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়।

১৯৯১ থেকে ৯৬ পর্যন্ত বেগম জিয়ার আমলে কোন কমিশন গঠন করা হয়নি। তখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আইন পাশ করা হয়।

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনার আমলে 'ড. কুদরত-ই-খুদা রিপোর্টের' ভিত্তিতে প্রফেসর মু. শামসুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২০০১ সালে ৪ দলীয় জোট সরকার কায়েম হবার পর ড. মুহাম্মদ মুনীরুয্যামান মিঞাকে চেয়ারম্যান করে 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩' গঠন করা হয়।

শেখ মুজীব ও শেখ হাসিনার আমল শিক্ষা-ব্যবস্থা খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ করা এবং ধর্ম শিক্ষা সরকারি ব্যয়ে বন্ধ করার প্রচেষ্টাই চলে। অন্যান্য আমলে এমনকি বর্তমান (২০০৪) চার দলীয় জোট সরকার আমলেও 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩' যে সুপারিশ মালা পেশ করেছে তাও সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। অবশ্য এতে মাদরাসা শিক্ষাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত শিক্ষা কমিশন ও কমিটিসমূহের রিপোর্ট ও সুপারিশমালার কোনটাই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথেই পূর্ববর্তী সরকারের আমলে প্রণীত শিক্ষা-ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায় এবং নতুন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়। যা হোক ঐ সব সুপারিশে যারা একমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থার চিন্তা করেছেন তারা ধর্ম-শিক্ষাকে বলতে গেলে বাদই দিয়েছেন। আর যারা ধর্ম-শিক্ষাকে বাদ দেননি তারা ধর্মীয় শিক্ষাকে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থার লেজুড় হিসেবে রেখেছেন।

প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক গলদ

ইসলামকে জাতীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতির ভিত্তিতে শিক্ষা পুনর্গঠন করতে হলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক গলদটুকু তালাশ করে বের করতে হবে।

যে কোন শিক্ষাব্যবস্থার মূলে যে প্রশ্নটি বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে তা এই যে, তা দ্বারা কোন্ ধরনের মানুষ গড়ে তোলা হবে। এ দেশে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাটি ইংরেজ শাসকদের অবদান। ইসলামী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত কর্মী তৈরি করার উদ্দেশ্যে ইংরেজগণ নিশ্চয়ই এ দেশের আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করেনি। এমনকি তারা নিজ দেশে যে প্রকার নাগরিক গঠন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছে, সে ধরনের উদ্দেশ্য এখানে ছিলো না; বরং এমন কতক লোক তৈরি করা তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো, যারা মুষ্টিমেয় ইংরেজ শাসকদের বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে এদেশে ইংরেজ শাসনকে জারি রাখতে সাহায্য করবে। তাদের এমন কতক লোক যোগাড় করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যারা ইংরেজদের কথা বুঝতে পারে, তাদের আদব-কায়দা, চালচলন, রীতিনীতি অনুকরণ করতে সক্ষম এবং তাদের আদর্শকে ভালোবাসতে রাজি।

ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত সেই শিক্ষাব্যবস্থাকেই অধিকতর উন্নত করার চেষ্টা চলছে। সেই ব্যবস্থার সাথে Religious Instruction (ধর্মীয় শিক্ষা)-এর নামে দীনিয়াতের সংযোগও ইংরেজদের অনুকরণ মাত্র। পাশ্চাত্য দেশসমূহে দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, অংক ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে যে প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয়, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মলাভ করে, বিশ্বাস ও জ্ঞান যে পথে ধাবিত হয়, আমাদের দেশে এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই।

বিশাল শিক্ষা-বৃক্ষকে যদি ইসলামের জীবন দর্শন থেকে নিরপেক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে সেই শিক্ষাবৃক্ষের কাণ্ডের সাথে দীনিয়াতের আলাদা কলম বেঁধে দিলে যে কি পরিণাম হয়, তার অভিজ্ঞতা আমাদের বহুবার হয়েছে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকালে এ পরিকল্পনাই গঠন করা হয়েছিলো। পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের ভিত্তিতে সবকিছু শিক্ষা দেবার সঙ্গে দীনিয়াতের অস্বাভাবিক সংযোগ সেখানেও ছিলো। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই এরূপ ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এক প্রকারের জীবের শরীরে অন্য জীবের অংশবিশেষ বেঁধে দিলে যে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা বেশি ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পার্থিব সকলশাস্ত্র এমনভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে ও বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে দেখানো হচ্ছে যে, এ বিশাল বিশ্বের কোন স্রষ্টা নেই। এটা নিজে নিজেই চলছে এবং সাফল্যের সাথে নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবেই চলছে। সমাজব্যবস্থা,

রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিধান শিক্ষা দেওয়ার ভিতর দিয়ে ছাত্রদের মগজে এ ধারণাই সৃষ্টি হচ্ছে যে, আল্লাহ, রাসূল, ওহী, কুরআন ইত্যাদি ব্যতীতই জগৎ উন্নতি লাভ করছে। সমগ্র শিক্ষার মাধ্যমে গোটা জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধেই তারা স্রষ্টানিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে যখন হঠাৎ দীনিয়াত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়, তখন আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত, ওহী ইত্যাদির কথা প্রথম প্রথম তাদেরকে অবাক করে। অতঃপর এ সকল বিষয় তাদের বিদ্রূপের জিনিস হয়ে দাঁড়ায়।

এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে হেয় মনে করা, ধর্মকে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বলে বিশ্বাস করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ ধরনের ব্যবস্থায় বড়জোর ধর্মকে শুধু একটি নিষ্ক্রিয় বিজ্ঞান হিসেবে কিছু লোকের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এটা জীবনকে ইসলামের ভিত্তিতে পরিচালিত করার যোগ্যতা কিছুতেই সৃষ্টি করবে না। এ ধরনের শিক্ষার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনে ইসলাম একটি অপ্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট হিসেবে স্থান পাবে।

ইসলাম এমন কোন ধর্মের নাম নয় যে, মানুষকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যাবতীয় কাজ করার অনুমতি দেবে, আর সেই সাথে কিছু কর্মহীন বিশ্বাস ও প্রাণহীন অনুষ্ঠানের পরিশিষ্ট জুড়ে দিলেই রাজি হবে। কারো গড বা ভগবান হয়তো বা এতে রাজি হতে পারে যে, গির্জা ও মন্দিরে তাকে ডাকলেই সে সন্তুষ্ট হবে এবং জীবনের অন্যান্য যাবতীয় ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও কর্মে তাকে ত্যাগ করলে কোন আপত্তি করবে না; কিন্তু কুরআনের আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি কারো সাথে আপস করতে রাজি নন। এ কারণেই তিনি মুমিনদের 'সম্পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও' বলে আহ্বান জানিয়েছেন।

আমরা একে অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে করি যে, আল্লাহ আছে বলে মানবো, অথচ তিনি পার্থিব জীবনে আমাদের পথপ্রদর্শক হবেন না। যে আল্লাহ দুনিয়ার চলার পথে আমাকে সঠিক হেদায়াত দেন না, তাকে শুধু মসজিদে মেনেই বা লাভ কি?

সুতরাং ইসলাম সম্বন্ধে যে শিক্ষার মাধ্যমে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় নিশ্চয়ই তা বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা। এর সাথে দীনিয়াতের শিক্ষাকে জুড়ে দিয়ে ইসলামকেও একটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব নির্জীব ধর্মেই পরিণত করা হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ধরন

বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাতে ইসলামের ধর্মীয় দিকটুকুরই চর্চা হয় মাত্র। ইসলামকে একটি ধর্ম হিসেবে শিক্ষা করার নাম ইসলামী শিক্ষা বলা কিছুতেই উচিত নয়। ইসলাম একটি জীবনদর্শন ও জীবন বিধান। মানব জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের জন্যই এর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও বিধান রয়েছে। ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শ বলে স্বীকার করলে, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক, ফারায়েয ইত্যাদি শিক্ষা দান করার দ্বারাই ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন পূর্ণ হতে পারে না।

যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাই ইসলামী শিক্ষা। সে শিক্ষা লাভ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মন, মগজ ও চরিত্র এমনভাবে গড়ে উঠবে, যাতে ইসলামের আদর্শে একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা

সৃষ্টি হয়। সে শিক্ষা লাভ করলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কুরআন যে দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করতে চায়, তাই লাভ করা যাবে। এ শিক্ষা ব্যক্তিজীবন হতে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত সকল দিকেই ইসলামের আদর্শকে মানব রচিত সকল আদর্শ হতে উন্নত ও প্রগতিশীল বলে প্রমাণিত করবে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা হতে উচ্চতম মান পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরেই এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায়ই কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাবতীয় শিক্ষা দান করতে হবে। ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কনীতি এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে, যাতে মানব রচিত মতবাদসমূহের সাথে তুলনা করে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মোটকথা, যে শিক্ষা মুসলিম দার্শনিক, মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম শাসক, মুসলিম বিচারক, মুসলিম অর্থনীতিবিদ, মুসলিম সেনাপতি, মুসলিম রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি সৃষ্টি করবে তাই ইসলামী শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। যদি ইসলামই আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হয়, তা হলে এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপযোগী একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে ছয়টি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১. শিক্ষাব্যবস্থাকে একই সঙ্গে দীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হতে হবে।
২. পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে যত প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করতে হয় সে সবকেই ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে শিক্ষা দিতে হবে।
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোটা পরিবেশকেই ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করতে হবে।
৪. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের সাথে মানব রচিত বিধানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল করতে হবে।
৫. যেহেতু কুরআন, হাদীস ও ফিকহ ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস, সেহেতু শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চস্তরে উন্নতমানের মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ সৃষ্টির উপযোগী বিশেষ কোর্স থাকতে হবে।

ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপ

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে যদি শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হয় তা হলে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবরূপ কি দাঁড়াবে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

দীন ও দুনিয়া

প্রথম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে দীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন পূর্ণ করার যোগ্য হতে হবে। দীন ও দুনিয়া কথাটি দ্বারা সাধারণত ধর্মীয় ও পার্থিব বলে কথিত দুটি পৃথক দিক মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে দীন ও দুনিয়া দুটি সামঞ্জস্যহীন পৃথক সত্তা নয়। অন্যান্য ধর্মে যেহেতু জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ বিধান

নেই (অন্তত অন্য কোন ধর্মের নেতৃবৃন্দ এরূপ দাবি করেন না), সেহেতু সে সব ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় শিক্ষার সাথে তাদের পার্থিব শিক্ষার যোগাযোগ নেই। তারা দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করে তা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মের প্রভাবমুক্ত। তারা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বিশ্বাস করে এবং ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে তারা ঐ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার পরিশিষ্টটুকু জুড়ে দেয়।

কিন্তু ইসলাম ঐ ধরনের কোন ধর্ম মাত্র নয়; ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালন করার উপযোগী শিক্ষাকে পূর্ণ ইসলামী শিক্ষা মনে করা মারাত্মক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য, সে শিক্ষাকে যদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয় তা হলেই তা ইসলামী শিক্ষায় পরিণত হয়।

মানুষকে পার্থিব জীবনে যা কিছু করতে হয় তা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী করলেই তা ইবাদতে পরিণত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন ও বিচার, পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্ম সকল মানুষকেই করতে হয়। যারা আল্লাহকে স্বীকারই করেনা তাদেরও এসব কাজ না করলে চলে না। জীবনের সকল কাজকর্মেই তারা নিজেদের মনগড়া নীতি বা অন্য কোন মানুষের রচিত নীতি ও বিধান অনুসরণ করে চলে। কিন্তু এ কাজগুলোই যদি কুরআন ও হাদীসের নীতি ও আইন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয় তাহলে এ সবই ইবাদতে পরিণত হয়। ইসলামে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানই শুধু ইবাদত নয়; গোটা জীবনটাকে ইবাদতে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন। একথা যদি স্বীকৃত হয় তাহলে ইসলামী শিক্ষা বাস্তব জীবন থেকে পৃথক কোন নিষ্ক্রিয় শিক্ষা হতে পারে না। দুনিয়ায় আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন যাপন করার উপযোগী শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। তাই ইসলামী শিক্ষায় দীন ও দুনিয়ার প্রচলিত কৃত্রিম পার্থক্য অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং দীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনকে এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে দেখাও অসম্ভব।

পার্থিব শিক্ষায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান পরোক্ষ (Indirect) শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। মানুষের মনস্তত্ত্ব গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এবং বাস্তব গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিক্ষার্থীদেরকে নীতিজ্ঞান ও তত্ত্বকথা পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে গেলে যতটা কার্যকরী হয়, বাস্তব কার্যকলাপের মাধ্যমে সে শিক্ষা দিলে অবচেতনভাবেই তা অধিকতর সুফল ও ফলপ্রসূ হয়। মানুষ স্বাভাবিক ও অভ্যন্তরীণ প্রেরণায় যা করতে চায় তাকেই শিক্ষামূলক করে তোলার নামই পরোক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষায় এ নীতির উপর ভিত্তি করেই খেলার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যাজ্ঞান, শব্দগঠন ইত্যাদি শিক্ষাকে শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় করা সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষাপদ্ধতির এই পরোক্ষ নীতিকে অবলম্বন করে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষাকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে শিক্ষা দিলে বাস্তব দিক দিয়ে অধিক কার্যকরী হবে। সুদ যে এক প্রকার জঘন্য যুলুম তা পৃথকভাবে মুখস্থ না করিয়ে যদি সুদের অংক কষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া যায়, তা হলে অবচেতনভাবেই শিক্ষার্থীর মনে তা সহজে কায়েম হবে। আমরা স্কুল জীবনে গোয়ালা কর্তৃক দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রয় করার অংকের মাধ্যমে যা শিখেছি, তাতে এরূপ সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রতি অন্তরে ঘৃণার সৃষ্টি হয়নি। সেখানে পরোক্ষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কিরূপে বেশি দামে কিনে পানি মিশানোর ফলে কম দামে বিক্রয় করেও গোয়ালা লাভবান হতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এ অংকটিতে "গোয়ালা কত লাভ করেছে" জিজ্ঞেস না করে যদি "গোয়ালা মানুষকে কত পরিমাণ ঠকিয়েছে" জিজ্ঞেস করি তাহলে সহজেই এ কাজের প্রতি ছাত্রদের ঘৃণার উদ্রেক হবে।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পড়ানোর সাথেই পবিত্রতার ইসলামী ধারণা দান করা হলে পবিত্রতা সম্পর্কে পৃথকভাবে মাসআলা শিক্ষা দেওয়ার অপেক্ষা বেশি উপকারী হবে। সৌরজগৎ সম্পর্কে ভৌগোলিক জ্ঞান দান করার সাথেই সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে ভূগোলবিজ্ঞানেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করবে।

এভাবে সকল স্তরের শিক্ষাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এবং সকল বিষয়কেই কুরআন হাদীসের জ্ঞান দান করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিক্ষার পরিবেশ

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গোটা পরিবেশ একেবারেই ইসলামবিরোধী। এ পরিবেশে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অধিক পরিমাণে পরিবেশন করলেও শিক্ষার্থীদের চরিত্রে ইসলামের কোন প্রভাবই প্রতিষ্ঠিত হবে না। নামায ইসলামী জীবনবিধানের দ্বিতীয় প্রধান ভিত্তি। কিন্তু আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকট তা 'ফরয' বলে গণ্য নয়। সেখানে নামায বাস্তব ক্ষেত্রে একটি মুবাহ (যা করা ও না করায় কোন লাভ-ক্ষতি নেই) কাজ মাত্র। ইসলাম পর্দার নির্দেশ দেয়; কিন্তু সেখানে পর্দা 'হারাম'। মিথ্যা প্রচার ও মিথ্যা সাক্ষ্য ইসলামে হারাম, কিন্তু সেখানে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে এ সবই আর্টের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী নৈতিকতার অধিকাংশ সীমাই সেখানে লঙ্ঘন করা সহজ; নৈতিকতা পালন করা সেখানে অত্যন্ত কঠিন।

বিশেষ করে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে উত্তরাধিকারসূত্রে ইসলামের বিশ্বাস ও মূল্যমান সম্পর্কে যেটুকু শিক্ষা ছোটসময় থেকে শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসে। কিন্তু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বিশ্বাস ও কর্মে প্রথমে দ্বন্দ্ব এবং পরে স্পষ্ট বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়। তাদের নৈতিক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হতে থাকে। গোটা শিক্ষা জীবনেই তারা বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করার এক ব্যাপক ট্রেনিং লাভ করতে থাকে।

এরই ফলে তাদের বাস্তব জীবন কোন বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিচয় বহন করে না। তারা ঘুষ খাওয়াকে অন্যায় বলে বিশ্বাস করলেও এ বিশ্বাসের বিপরীত চলারই শিক্ষা লাভ করেছে। জাতির খিদমত করা কর্তব্য বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজের খিদমত করার মহান ট্রেনিংই এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে লাভ করেছে।

জাতির মূল্যমান ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোটা পরিবেশ গড়ে তোলা না হলে শুধু কিতাবী বিদ্যা দ্বারা চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না। বিদেশে যে সমস্ত বই পড়ানো হয় আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও সেসব বই-ই পাঠ্য আছে। কিন্তু ঐসব দেশে সমাজের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে শিক্ষার পরিবেশের বিরোধ সামান্যই আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা তাদের বিশ্বাসের বিপরীত নয়। সুতরাং তাদের বিশ্বাস মোতাবেক চরিত্রই সেখানে সৃষ্টি হয়। ফলে সেসব দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এতোটা নৈতিক অধঃপতন দেখা যায় না।

প্রকৃত কথা এই যে, চরিত্র সৃষ্টির জন্য কিছু মূল্যবোধ প্রয়োজন। যদি মূল্যবোধ ও বাস্তব শিক্ষা একরূপ হয় তবেই চরিত্রের উন্নতি সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে আমাদের সাধারণ মূল্যবোধের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং হয় আমাদের মূল্যবোধের বিশ্বাসকে বদলে শিক্ষার পরিবেশ মোতাবেক গঠন করতে হবে, না হয় পরিবেশকে ঈমান অনুযায়ী সংস্কার করতে হবে। প্রথম অবস্থায় আমরা বিশুদ্ধ অনৈসলামিক চরিত্র সৃষ্টি করবো। আর দ্বিতীয় অবস্থায় সত্যিকার ইসলামী চরিত্র গঠিত হবে।

উচ্চশিক্ষার ইসলামী রূপ

জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত লোকেরাই নেতৃত্ব দান করে। কারণ চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্বই প্রকৃত নেতৃত্ব। বর্তমানে আমাদের দেশে অনৈসলামী বা ইসলাম নিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষিত লোকের নেতৃত্বের ফলেই সমাজে ইসলামের প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই উচ্চশিক্ষাকে 'ইসলামী' করে গঠন না করলে বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজে ইসলামী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে ইসলামী জীবন দর্শন, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান এবং কুরআনের ইতিহাস দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ ব্যতীত প্রচলিত পন্থায় এসব বিষয় শিক্ষা দিতে থাকলে পৃথকভাবে দীনিয়াত শিক্ষা যতই দেওয়া হোক, তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মগজ কিছুতেই ইসলামের ছাঁচে গঠিত হবে না।

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত করার পর শুধু কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর শিক্ষা দ্বারা কিছুতেই ইসলামের ইতিহাস-দর্শনকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের উচ্চশিক্ষা কুরআনের ইতিহাস দর্শনের সাথে অন্যান্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা দ্বারাই তা সম্ভব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দেবার পর রাসূল (স)-এর শাসনব্যবস্থার ভাসাভাসা আলোচনা কিছুতেই মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সৃষ্টি করবে না। তাই শিক্ষার বিষয়সমূহকে এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে, যাতে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীগণ মুসলমান বৈজ্ঞানিক, মুসলমান দার্শনিক, মুসলমান ঐতিহাসিক এবং মুসলমান অর্থনীতিবিদ হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।

শিক্ষার বিষয়সমূহকে প্রচলিত নিয়মে শিক্ষা দিতে থাকলে ধর্মীয় শিক্ষা যদি শিক্ষার সকল স্তরে বাধ্যতামূলকও করা হয়, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের একাংশ মসজিদে মুসলমান, রাজনীতিতে গণতন্ত্রী, অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রী এবং পারিবারিক জীবনে ফ্রয়েডপন্থি হিসেবে গঠিত হয়ে কিছুসংখ্যক কার্টুনে পরিণত হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গঠন করতে হলে শিক্ষার সকল বিষয়কেই ইসলামের ছাঁচে ঢেলে গঠন করতে হবে।

ইসলামে জ্ঞানের উৎস

কুরআন ও হাদীসই ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস। আরবী ভাষায় মূল কুরআন ও হাদীসকে পূর্ণরূপে বুঝার লোকের অভাব হলে জীবনের সকল দিকেই ইসলামের প্রভাব ক্ষুণ্ন হবে। তদুপরি বহু শতাব্দীর কঠোর সাধনার ফলে কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে যে ইসলামী আইনশাস্ত্র বা ফিক্হ গড়ে উঠেছে তাও আরবী ভাষায়ই রচিত। সুতরাং কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ সম্পর্কে গভীর গবেষণা করার যোগ্য প্রতিভাবান লোক তৈরি না হলে ইসলামী শিক্ষা তো দূরের কথা, ইসলামী সমাজই টিকতে পারবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষার পর বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার যেমন ব্যবস্থা থাকে, তেমনি কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য শিক্ষার উচ্চস্তরে বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এর মাধ্যমে যে সকল মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ তৈরি হবে প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ইসলামী দৃষ্টিতে সর্বক্ষেত্রে জাতিকে নেতৃত্ব দেবার যোগ্য হবে। কিন্তু তারা যদি মানব সমস্যা, আধুনিক জগৎ ও প্রচলিত চিন্তাধারার সাথে পরিচিত না হয় তাহলে তাদের কুরআন-হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের কোন উপকারে আসবে না। সুতরাং তাদেরকে ডিগ্রি পর্যায়েও বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে হবে, যাতে তারা কুরআন ও হাদীসের আলোকে জাতিকে যোগ্য ইসলামী নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়।

শিক্ষকদের আদর্শ

শিক্ষার ব্যাপারে সকল অবস্থায়ই শিক্ষকের গুরুত্ব সর্বাধিক। শিক্ষকের বিদ্যা ও চরিত্রের মানের উপর চিরদিনই শিক্ষার ফল প্রধানত নির্ভরশীল। "কী পড়ানো হচ্ছে" তার চেয়ে "কী ধরনের শিক্ষক পড়াচ্ছেন" এর মূল্য ও গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। তাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকগণকে চিন্তা ও কর্মে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। কিতাবী বিদ্যা অপেক্ষা বাস্তব উদাহরণ অনেক বেশি কার্যকর হয়। যদি শিক্ষকগণ ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শস্থানীয় হন তাহলে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হবে।

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের উন্নতি

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ন্যায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান আজ বিরাট উন্নতি লাভ করেছে। এ উন্নতিকে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে যাতে ব্যবহার করা যায়, সেদিকেও আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। ইসলামের চর্চা করার জন্য আমরা যেমন মাইক্রোফোন ব্যবহার করি, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণার ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে তাও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।

অতীত ও বর্তমানের দার্শনিকদের গবেষণা এবং শিক্ষাবিদদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা সম্পর্কে এতো তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে যে, শিক্ষা আজ রীতিমতো এক বিরাট বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করলে বর্তমান যুগের উপযোগী মানের লোকদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করা অসম্ভব হবে। সুতরাং ইসলামী নৈতিকতার সীমার মধ্যে থেকে আধুনিক সকল উপায়-উপকরণকেই ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে।

উপসংহার

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই প্রবন্ধে শিক্ষাপদ্ধতির ইসলামী রূপ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা সরকারি পরিকল্পনা ব্যতীত ব্যাপকভাবে প্রচলন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আর যে সরকার ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করেনি, সে ধরনের কোন সরকারকে এরূপ কোন কাঠামোর ভিত্তিতে একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে বললেও কোন সুফল পাওয়া যাবে না।

সমাজে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য সর্বক্ষেত্রে যেমন কিছুসংখ্যক মুজাহিদদের সুসংবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদেরকে চিন্তা ও গবেষণার সাথে সাথে ক্ষুদ্রাকারে হলেও এরূপ একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এভাবেই যখন কোন সমাজে একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন চলতে থাকে, তখন জীবনের সকল দিকেই উপযুক্ত চিন্তানায়ক ও কর্মবীরের দল তৈরি হতে থাকে। কোথাও এরূপ একটি আন্দোলন বিজয়ী হলে অতি সহজেই উপরিউক্তরূপ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবে পরিণত হবে। সুতরাং যারা ইসলামের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেন তাদেরকে একটি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবার পরিকল্পনাকেও নিজেদের কর্মসূচির একটি বিশেষ অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

(ঢাকায় ১৯৬১ ইসলামী সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা)

"ইসলামের ইতিহাস থেকে আমি একটি শিক্ষালাভ করেছি যে, মুসলিমদের ভয়াবহ বিপদের সময় একমাত্র ইসলামই তাদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আজ যদি আপনারা পুনর্বার ইসলামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং তার জীবনীশক্তি উৎপাদক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন, তাহলেই আপনাদের মহান অস্তিত্ব ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা পাবে।"